icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

স্বাস্থ্য সংলাপ

ISSN 1021-2078

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ১৫ ■ সংখ্যা ২ ■ অগ্রহায়ণ ১৪১৩

এলার্জিক রাইনাইটিস

রোগতত্ত্ব ও পরিত্রাণের উপায়

সাবাহ উদ্দিন আহমেদ
মুহঃ শামীম বিন সাঈদ খান
এম শাহাদাত হোসেন

মিসেস মায়া একজন বিসিএস কর্মকর্তা। শীতের সকালে ঘুম থেকে ওঠেন বিষন্ন মনে। মাথাব্যথা আছে ও মাথায় কী যেন চাপ দিয়ে ধরে আছে এমন মনে হয় তাঁর কাছে। বার বার হাঁচি আসে এবং একবার শুরু হলে বেশ কিছুক্ষণ চলতে থাকে। নাক দিয়ে অবিরত পানি ঝরে এবং নাক ও চোখ চুলকায়। ঘুমের সময় তাঁর মুখ শুকিয়ে যায়। ঘুম থেকে ওঠার পর নাকের পিছনে অথবা গলায় অল্প কাশি জমে থাকে। এর সাথে কান ভার-ভার লাগে এবং নিজের মুখের কথা কানে বাজে। সারাদিন ঘুম-ঘুম ভাব নিয়ে তাঁকে অফিস করতে হয়। অফিসের কাজে সঠিক মনোনিবেশ করতে পারেন না। সহকর্মীদের সামনে তাঁর এ-অবস্থার জন্য তাঁকে প্রায়ই বিব্রত হতে হয়। আসলে তিনি একটি রোগে ভুগছেন যাকে বলা হয় 'এলার্জিক রাইনাইটিস'। ঠাণ্ডাজনিত এলার্জি থেকে তাঁর এ-উপসর্গগুলি সৃষ্টি হয়েছে। এলার্জিক রাইনাইটিস (allergic rhinitis) এক ধরনের নাসিকা-ঝিল্লির (nasal mucosa) প্রদাহের কারণে হয়ে থাকে।

এ-রোগের সাথে আইজি-জি (IgG) অ্যান্টিবডির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এছাড়া, এ-রোগের সাথে চোখের এলার্জিক কনজাংটিভাইটিস এবং শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহজনিত রোগ অ্যাজমাও থাকতে পারে। উন্নত, উন্নয়নশীল, অথবা অনুন্নত কোনো দেশই এ-রোগের বিস্তার থেকে মুক্ত নয়। এ-রোগে যিনি আক্রান্ত হন তিনি যেমন কাজেকর্মে সঠিক মনোযোগ দিতে পারেন না, তেমনি উপসর্গের কারণে আশপাশের লোকজন বিরক্ত বোধ করেন। শিশুরা এ-রোগে আক্রান্ত হলে ক্লাসে মনোযোগী হতে পারে না এবং লেখাপড়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। বয়স, লিঙ্গ ও অঞ্চলভেদে এ-রোগে আক্রান্ত লোকের শতকরা হার ১০ থেকে ২০। এ-রোগের বিস্তৃতি পুরুষের মধ্যেই বেশি। ৫ থেকে ২৪ বছর-বয়সীদের মধ্যে এ-রোগের প্রকোপ বেশি। ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশেও এধরনের রোগীর সংখ্যা মোটেই কম নয়।

শ্রেণীবিন্যাস/প্রকারভেদ

এলার্জিক রাইনাইটিস রোগকে মূলত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে: ১. পেরিনিয়াল (perinial)—যেসব রোগী সারাবছর এ-রোগে ভোগেন; ২. সিজনাল (seasonal)—যারা ঋতু পরিবর্তন, যেমন গ্রীষ্মকাল ও শীতকালের মাঝামাঝি সময়ে আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে এ-রোগে ভোগেন; এবং ৩. পেশাভিত্তিক (occupational)—এধরনের অসুস্থতা সাধারণত পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হতে পারে, যেমন কৃষিকাজের সময় কিংবা রংশিল্পে কাজ করার সময় কেউ এ-অসুস্থতায় আক্রান্ত হতে পারেন।

কখনো কখনো প্রথম দু'টি অবস্থার সংমিশ্রণ হতে দেখা যায় অর্থাৎ পেরিনিয়াল রাইনাইটিস রোগীদেরও ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে রোগের উপসর্গের তীব্রতা মাত্রাতিরিক্ত হতে পারে।

কারণ

কী কী বিষয়ের সাথে এলার্জিক রাইনাইটিসের সম্পৃক্ততা রয়েছে তা আমাদের জানা খুবই জরুরী। এগুলো হতে পারে:

১. ক্ষুদ্র কীট, পোকামাকড়, গৃহপালিত পশু এবং এদের মল (বিশেষভাবে উল্লেখ্য ইঁদুরের মল)
২. ফুলের রেণু
৩. ছত্রাকজাতীয় পদার্থ
৪. শিল্পাঞ্চল ও শহরের কালো ধোঁয়া, নাইট্রাস অক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, ওজোন, প্রভৃতি গ্যাস থেকে এ-রোগের সৃষ্টি হতে পারে
৫. ব্যথা নিবারণের জন্য ব্যবহৃত এসপিরিন (aspirin) ও অন্যান্য এনএসএআইডি (NSAIDs) থেকে এলার্জিক রাইনাইটিস হতে পারে। এছাড়া, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবহৃত কিছু কিছু ওষুধ সেবনে এ-রোগ হতে পারে
৬. বাবা অথবা মা কিংবা উভয়ের এলার্জিক রাইনাইটিস থাকলে তা সন্তানের মধ্যে যথাক্রমে শতকরা ২৯ ভাগ ও ৪৭ ভাগ ক্ষেত্রে সংক্রামিত হতে দেখা যায়। যেকোনো বয়সের মানুষ, এমনকি ৬ মাসের বাচ্চাও, এ-রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে বেশিরভাগই আক্রান্ত হন ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সের মধ্যে।

ভেতরের পাতায়

কিডনী ও মূত্রতন্ত্রের অসুস্থতায় করণীয় ২
নবজাতকের নাভীর প্রদাহ ৪
ফিরে এসেছে কালাজ্বর ৫
ব্রংকিয়োলাইটিস ৭
হঠাৎ করে অজ্ঞান হওয়া ৮

icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাবিষয়ক কর্মকাঠামোও আইসিডিডিআর,বি'র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিস্কার ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক	ডেভিড এ স্যাক
উপ-প্রধান সম্পাদক	প্রদীপ কুমার বর্ধন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	এম শামসুল ইসলাম খান
সম্পাদক	এম এ রহিম
পৃষ্ঠাবিন্যাস	সৈয়দ হাসিবুল হাসান
কম্পোজ	হামিদা আক্তার

সদস্য

আসেম আনসারী, রুখসানা গাজী, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ ইকবাল, মাসুমা আক্তার খানম, সুমনা লিজা, মোঃ আনিসুর রহমান, রুবহানা রকিব ও পিটার থর্প।

কারা স্বাস্থ্য সংলাপ পেতে পারেন

যেকোনো পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্কুল গ্রন্থাগারসমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সংলাপ পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হলে আপনার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ ঠিকানা ব্যবস্থাপনা সম্পাদক বরাবর ইংরেজিতে লিখে পাঠান। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীলমোহরযুক্ত দাপ্তরিক প্যাডে আবেদন করতে হবে।

প্রকাশক

আইসিডিডিআর,বি
মহাখালি, ঢাকা ১২১২
(জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২২৪৬৭, ৮৮৬০৫২৩-৩২
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮৮১৯১৩৩, ৮৮২৩১১৬
ইমেইল: msik@icddrb.org

মুদ্রণ: ডট নেট লিমিটেড, ফোন: (৮৮০২) ৯৫৬৩৫৭৮

রোগের লক্ষণ

নাকের সিজনাল এলার্জির ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে হাঁচি হয়। একবার শুরু হলে ১০ থেকে ২০টি হাঁচি হতে পারে, এর সাথে নাক বন্ধ হয়ে-যাওয়া, নাক দিয়ে পানি-ঝরা এবং নাকের ভিতর চুলকানো, প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। এর পাশাপাশি চোখ চুলকানো, গলা চুলকানো, প্রভৃতি সমস্যা দেখা দেয়। কখনো কখনো শ্বাসকষ্টও হতে পারে। তবে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে রোগের লক্ষণগুলোর তীব্রতাও পরিবর্তিত হয়।

নাকের পেরিনিয়াল এলার্জির ক্ষেত্রে লক্ষণের তীব্রতা এত বেশি নয়। প্রায়ই ঠাণ্ডা-লাগা, নাক বন্ধ হয়ে-যাওয়া, নাকে গন্ধ ঠিকমত না-পাওয়া, গলায় সামান্য সাদাটে কাশি জমে থাকা, প্রায়ই কাশি-থাকা এবং কান ভার-ভার লাগা কিংবা কানে কম-শোনার লক্ষণ থাকতে পারে। এছাড়া চোখের পাতা (eyelid) ফুলে যেতে পারে। কখনো কখনো গলার স্বরেও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

পরিত্রাণের উপায়

এলার্জিক রাইনাইটিসের সঠিক কারণ নির্ণয় করতে না-পারলে তা থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই। তবে কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চললে এবং নিয়মিত ওষুধ সেবন করলে এ-রোগ নিয়ন্ত্রণে রেখে সুস্থ থাকা যায়। যে-কারণে এলার্জি হচ্ছে সেগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা চালাতে হবে, যেমন কারো ফুলের রেণু থেকে এলার্জি হতে পারে অথবা বিশেষ কোনো খাবার থেকেও হতে পারে। এ-ক্ষেত্রে সেই নির্দিষ্ট ফুলের রেণু নাকের কাছে নেওয়া যাবে না অথবা সেধরনের খাবার বর্জন করতে হবে। বায়ুদূষণের কারণে এলার্জি হলে নাকে-মুখে মাস্ক পড়তে হবে এবং এধরনের বায়ুদূষণ বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এধরনের রোগীদের ঘর ঝাড়ু দেওয়া অথবা ঘরের ঝুল পরিষ্কার করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ কারো পেশা হয়ে থাকলে তা পরিবর্তন করতে হবে। আমরা সাধারণত দৈনিক ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে প্রায় ১৮ ঘণ্টা থেকে ২০ ঘণ্টা ঘরের ভিতর অবস্থান করি। এজন্য, যে-ঘরে আমরা অবস্থান করি সেটি যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। শোবার ঘরে সারাদিন যে-চাদর বিছানো থাকে তা রাতে শুতে যাওয়ার সময় পরিবর্তন করে পরিষ্কার চাদর বিছিয়ে নিতে হবে।

ওষুধ ব্যবহার করে এ-রোগ থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন এ-নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। তবে ওষুধের সঠিক ব্যবহারের ফলে এ-রোগের লক্ষণ থেকে সাময়িক পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ওষুধ মুখে খাওয়া যেতে পারে কিংবা স্থানীয়ভাবে নাকের ভিতর ব্যবহার করা যেতে পারে। মুখে খাওয়ার ওষুধগুলোর মধ্যে রয়েছে কিটোটিফেন (ketotifen), সেটিরিজিন (cetirizine), লরাটিডিন (loratidine), প্রভৃতি। স্থানীয়ভাবে ব্যবহারের জন্য স্টেরয়েডজাতীয় নাকের স্প্রে রয়েছে। এছাড়া, সাময়িক ব্যবহারের জন্য জাইলোমেটাজলিন নাকের ড্রপও রয়েছে। অবশ্য এধরনের ড্রপ একাধারে ২ সপ্তাহের বেশি ব্যবহার না-করাই ভালো।

আমাদের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি রয়েছে যে, এলার্জি হতে পারে এমন খাবার, যেমন ডিম, বেগুন, গরুর মাংস, চিংড়ি মাছ ও ইলিশ মাছ, খেলেই এলার্জি হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সব খাবারই সবার জন্য এলার্জি তৈরি করে না, যেমন কারো ইলিশ মাছ খেলে এলার্জি হয়, আবার কারো গরুর মাংস খেলে এলার্জি হয়। এক্ষেত্রে যার যে-খাবার থেকে এলার্জি হয় তাকে শুধু সেই খাবারই বর্জন করা উচিত।

এলার্জিক রাইনাইটিস শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সমস্যা নয়। এর ফলে সামাজিক সমস্যাও তৈরি হয়। কখনো কখনো নাক থেকে কানের প্রদাহের সৃষ্টি হয়, যা থেকে রোগী পরবর্তীকালে কানে কম শুনতে পারে। এধরনের রোগীদের সাইনোসাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা দুই-তিন গুণ বেড়ে যায়। কখনো কখনো এলার্জিক রাইনাইটিসের সাথে ব্রংকিয়াল অ্যাজমা থাকতে দেখা যায়। নাক বন্ধ থাকার জন্য ফুসফুসজনিত উচ্চ রক্তচাপ (pulmonary hypertension) হতে পারে। তাই অবহেলা না-করে এলার্জিক রাইনাইটিসের সঠিক কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসার দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। ■

কিডনী ও মূত্রতন্ত্রের অসুস্থতায় করণীয়

কাজী রফিকুল আবেদীন
আনোয়ারুল ইকবাল

পৃথিবীর অন্যতম ঘন জনবসতিপূর্ণ দেশ বাংলাদেশ। ছোট্ট এই দেশটির জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি। উন্নয়নশীল এই দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী হাজারো সমস্যার সম্মুখীন—যার মধ্যে স্বাস্থ্য সমস্যা অন্যতম। এসব স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে কিডনী ও মূত্রতন্ত্রের অসুস্থতা একটি বেশ গুরুতর সমস্যা।

কিডনী ও মূত্রতন্ত্রের অন্যতম কাজ হচ্ছে আমাদের শরীরের পানি ও লবণের ভারসাম্য রক্ষা করা, শরীরে সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থ নিঃসরণে ভূমিকা রাখা আর সামান্য মাত্রায় হলেও সুস্থ শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু কিছু হরমোন তৈরি করা। অন্যদিকে, কিডনী ও মূত্রতন্ত্র যদি যথাযথভাবে কাজ করতে না-পারে তবে কেবলমাত্র স্বাভাবিক জীবনযাপনই বাধাগ্রস্ত হবে না, জীবন ধারণই অসম্ভব হয়ে উঠবে। কিডনী ও মূত্রতন্ত্রের বিভিন্ন অসুস্থতা ক্রমান্বয়ে কিডনী বিকলতায় রূপ নেয়, ফলে অকালে নিভে যায় লক্ষ লক্ষ সম্ভাবনাময় মানুষের জীবন প্রদীপ।

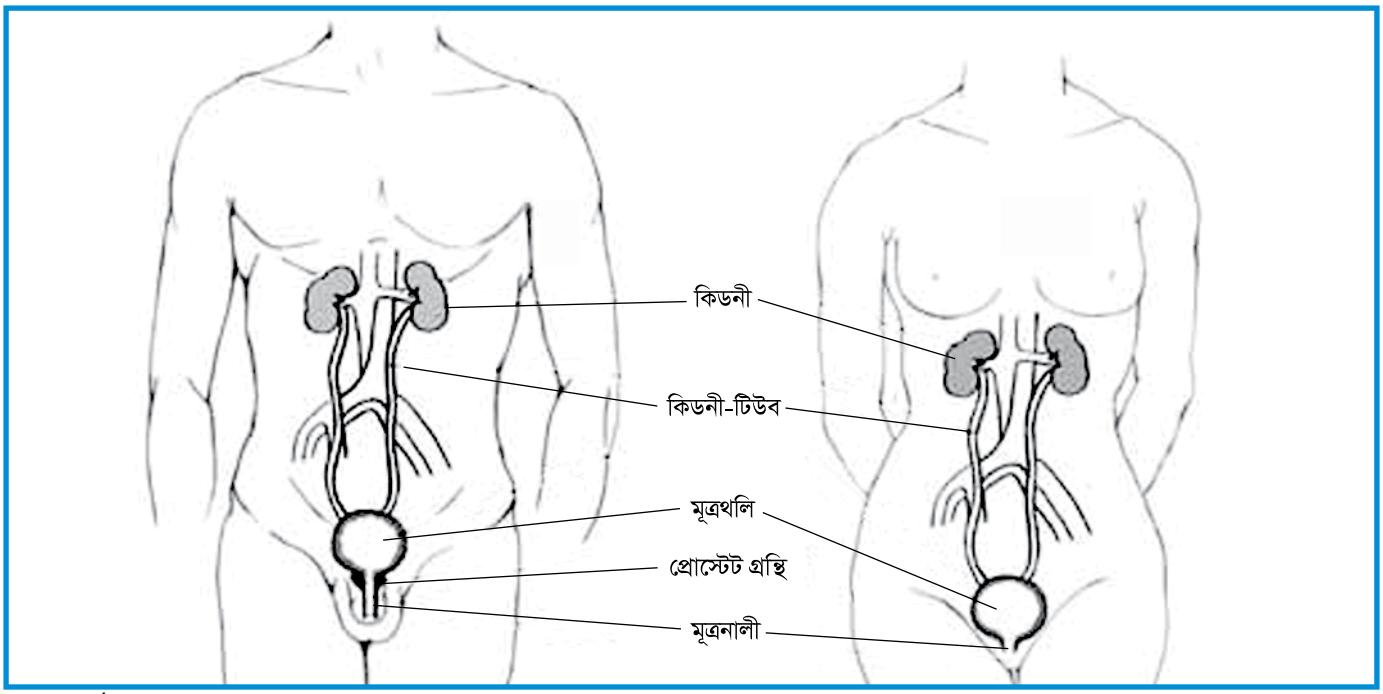

মূত্রতন্ত্রের গঠন

কিডনী ও মূত্রতন্ত্রের যেসব অসুস্থতা সাধারণত হয়ে থাকে তার বেশিরভাগেরই কারণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। এসব কারণ এড়িয়ে চললে কিডনী ও মূত্রতন্ত্রের অসুস্থতা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

একটি কথা বিশেষভাবে সত্যি যে, কোনো ব্যক্তি যদি কিডনী ও মূত্রতন্ত্রের রোগে আক্রান্ত হন এবং চিকিৎসক উপসর্গ লক্ষ করে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তবে এ-রোগ প্রাথমিক পর্যায়ে নিরাময় ক'রে বা চিকিৎসা নিয়ে প্রায় স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবন যাপন সম্ভব। অন্যদিকে, যদি প্রাথমিক পর্যায়ে রোগের লক্ষণ বিবেচনায় নিয়ে রোগ নির্ণয় ও যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা না-নেওয়া হয়, তবে সময়ের ব্যবধানে রোগ জটিল থেকে জটিলতর হয়, এমনকি কিডনী বিকল হয়ে পড়ে। এ-পর্যায়ে রোগের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল, আর চিকিৎসা-সুবিধা দেশে অপ্রতুলও বটে। এখন পর্যন্ত এসব চিকিৎসা (ডায়ালাইসিস বা কিডনী প্রতিস্থাপন) রাজধানী ঢাকাসহ দু'চারটে বিভাগীয় শহরে করা সম্ভব। কিন্তু এ-চিকিৎসা এতই ব্যয়বহুল যে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের পক্ষে এ-চিকিৎসার ব্যয় সংকুলান প্রায় অসম্ভব।

যেহেতু এ-রোগের কারণগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জানা, তাই প্রতিরোধ পদ্ধতিও আমাদের আয়ত্তের ভেতরে এবং তা পালন করা সহজ ও সামান্য খরচেই সেটা সম্ভব। কারো রোগ হলেও প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয় করে যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে এসব রোগের নিরাময়, রোগের পরিণতিকে ধীরগতিসম্পন্ন করা এবং কিডনী-বিকলতার মতো চূড়ান্ত অসুস্থতা সৃষ্টিকে প্রলম্বিত করা সম্ভব, যার ফলে রোগসৃষ্ট কষ্ট, দুর্ভোগ, অকালমৃত্যু এবং অসম্ভব ব্যয়বহুল চিকিৎসা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। এভাবে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র দূর্বিসহ এসব অভিজ্ঞতা থেকে রক্ষা পেতে পারে এবং বিপুল চিকিৎসা ব্যয় বাঁচানো সম্ভবপর হতে পারে।

কিডনী ও মূত্রতন্ত্রের গঠন

- কিডনী (প্রতিটি মানুষের দেহে দু'টি কিডনী আছে)
- কিডনী-টিউব
- প্রস্রাবের থলি
- প্রোস্টেট গ্রন্থি (শুধুমাত্র পুরুষের থাকে)
- মূত্রনালী

কিডনী ও মূত্রতন্ত্রের কাজ

- শরীরে পানি ও লবণের ভারসাম্য রক্ষা করা
- শরীরে সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থ নিঃসরণে ভূমিকা রাখা
- সুস্থ শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু কিছু হরমোন তৈরি করা
- শরীরের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করা
- লোহিত কণিকা তৈরিতে সাহায্য করা
- শরীরে এসিড ও ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করা

কিডনী ও মূত্রতন্ত্রের অসুস্থতার সম্ভাব্য কারণ

- শিশুদের নানারকম চর্মরোগ ও ত্বকের প্রদাহ
- শিশুদের গলা/টনসিলের প্রদাহ
- ডায়রিয়াজনিত কারণে শরীরে আকস্মিক পানিশূন্যতা
- অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস ও তার জটিলতা
- অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ ও তার জটিলতা
- মূত্রতন্ত্রের জন্মগত ত্রুটি ও জটিলতা
- প্রস্রাবে ঘনঘন, দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ
- কিডনী, প্রস্রাবের থলি, প্রস্রাবের রাস্তায় পাথর-হওয়া ও জটিলতা সৃষ্টি-হওয়া
- প্রস্রাব নির্গমণ পথে বাধাপ্রাপ্ত-হওয়া (প্রস্রাবের রাস্তা চিকন-হওয়া, কিডনী থেকে প্রস্রাবের রাস্তায় যেকোনো স্তরে বাধাপ্রাপ্ত-হওয়া, প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড বড়-হওয়া)
- সন্তান প্রসব-সংক্রান্ত জটিলতা
- ব্যথানাশক ওষুধের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া সেবন করা
- দূর্ঘটনাজনিত কারণে কিডনী ও মূত্রতন্ত্রের জখম হওয়া বা কার্যক্ষমতা নষ্ট-হওয়া

কিডনী ও মূত্রতন্ত্রের অসুস্থতার প্রাথমিক লক্ষণ

- ঘনঘন প্রস্রাব-হওয়া
- প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া
- প্রস্রাবে রক্ত-যাওয়া
- প্রস্রাবের সঙ্গে আমিষ নিঃসরণ
- কোমরের উপরে ব্যথা-হওয়া
- শরীর, বিশেষত মুখ ও পা ফুলে-যাওয়া
- ক্ষুধামন্দা, বমিবমি ভাব বা বমি-হওয়া
- প্রস্রাবের পরিমাণ কমে-যাওয়া
- অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস
- অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ
- প্রস্রাব করার সময় বাধা অনুভব করা
- প্রস্রাব করতে না-পারা
- মূত্রতন্ত্রের কোনো স্তরে পাথরের উপস্থিতি প্রমাণিত হওয়া

কিডনী ও মূত্রতন্ত্রের রোগ নির্ণয়ে প্রাথমিকভাবে করণীয়

- রোগীর ইতিহাস জানা
- রোগীকে শারীরিকভাবে পরীক্ষা করা
- প্রস্রাবের রুটিন পরীক্ষা
- প্রস্রাবের প্রদাহের কারণ নির্ণয়ের জন্য জীবাণু চিহ্নিত করার পরীক্ষা
- কিডনী ও মূত্রতন্ত্রের আলট্রাসনোগ্রাফি
- কিডনী ও মূত্রতন্ত্রের এক্স-রে
- রক্তে ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিন-এর পরিমাণ নির্ণয়

রোগ প্রতিরোধে করণীয়

- পরিমিত পানি পান করা
- শিশুদের চর্মরোগজনিত ত্বকের প্রদাহের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শে সঠিক সময়ে যথাযথ চিকিৎসা করানো
- সঠিক সময়ে টনসিল বা গলার প্রদাহের যথাযথ চিকিৎসা করা
- প্রস্রাবে ঘনঘন প্রদাহ হলে কারণ নির্ণয় করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিশ্চিত করা
- উচ্চ রক্তচাপ ও বহুমূত্র রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং চিকিৎসকের পরামর্শমত সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা করা
- ব্যথানাশক ওষুধ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার না-করা
- প্রস্রাব পরিত্যাগে বাধা অনুভূত হলে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা
- কিডনীতন্ত্রে পাথর থাকলে চিকিৎসা করানো এবং পাথর সৃষ্টির কারণ খুঁজে বের ক'রে তার চিকিৎসা করা
- খাদ্যে কৃত্রিম রঙের ব্যবহার পরিহার করা
- খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থসহ খাদ্যদ্রব্যে সব কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ পরিহার করা
- ধুমপানে বিরত থাকা
- দূর্ঘটনাজনিত কিডনীতন্ত্রের জখমে সঠিকভাবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসা নিশ্চিত করা
- প্রস্রাবজনিত জটিলতায় সঠিকভাবে চিকিৎসা করানো
- জন্মগত ত্রুটি জন্মের আগে থেকেই বা জন্মের পর যথাসম্ভব দ্রুত চিকিৎসা করানো
- নির্দিষ্ট বয়সের পরে বছরে অন্তত একবার প্রস্রাব পরীক্ষা করানো এবং কিডনী ও মূত্রতন্ত্রের আলট্রাসনোগ্রাফি করানো

উল্লিখিত বিষয়ে আপনার সচেতনতা ও দৈনন্দিন জীবনে এগুলো মেনে চলা জীবনঘাতী কিডনী ও মূত্রতন্ত্রের অসুস্থতা থেকে আপনাকে রক্ষা করতে পারে। ■

নবজাতকের নাভীর প্রদাহ

মোঃ আবজালুল বাশার

নাভীর প্রদাহের আসল পরিসংখ্যান জানা নেই। উন্নত দেশগুলোতে তুলনামূলকভাবে এটি কম ঘটে। সম্ভবত, যেসব বাচ্চাকে হাসপাতাল থেকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয় এবং বাড়িতে যাদের ঠিকমত পরিচর্যা করা হয় না তাদের নাভীর প্রদাহ বেশি হয়।

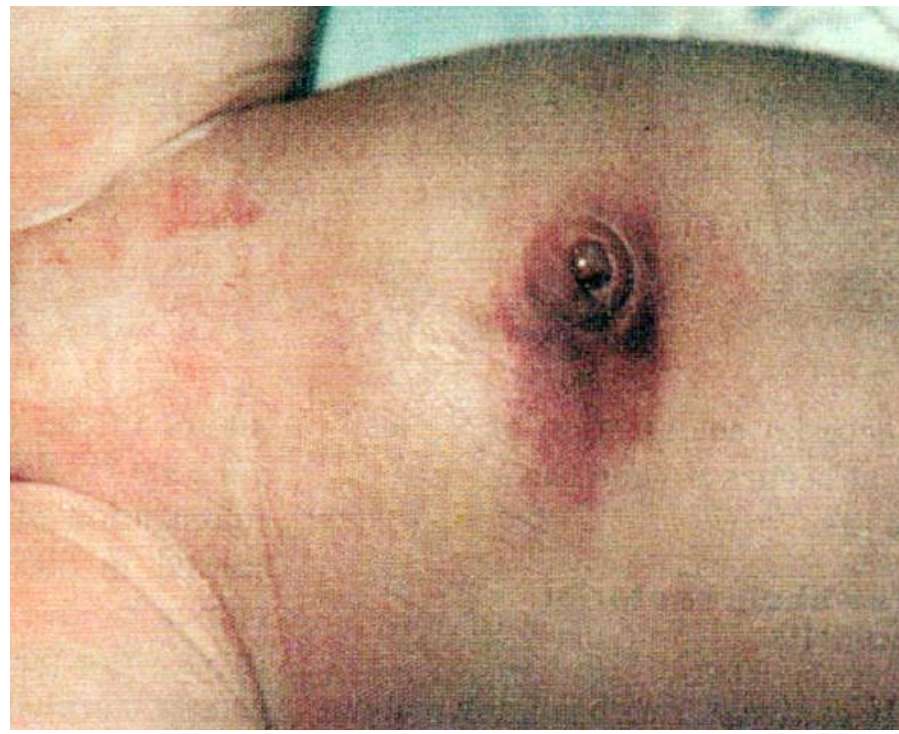

একটি বড় হাসপাতালের ৬ বছরের গবেষণায় দেখা গেছে, হেক্সাক্লোরোফেন দ্বারা যাদেরকে নিয়মিত গোসল করানো হয়েছে তাদের মধ্যে স্বাভাবিক ওজনের বাচ্চাদের ০.৫%-এর এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চাদের ২.০৮%-এর নাভীর প্রদাহ হয়।

গড়ে ৩.২ দিন বয়সের বাচ্চাদের এই নাভীর প্রদাহ সবচেয়ে বেশি হয়। উন্নয়নশীল দেশে নাভীর প্রদাহ সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। এক হাসপাতাল জরিপে দেখা গেছে, নাভীর প্রদাহের ৪৭% ক্ষেত্রে রক্তদূষণ (sepsis) দেখা দেয় এবং এই নাভীর প্রদাহের কারণেই ২১% ক্ষেত্রে অন্যান্য রোগের সৃষ্টি হয়।

প্রদাহের কারণ

উন্নত দেশে যেসব জীবাণু দ্বারা নাভীর প্রদাহ হয়ে থাকে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে *Staphylococcus aureus, Escherichia coli* group ও *Streptococcus*। উন্নয়নশীল দেশে বাড়িতে অথবা হাসপাতালে কোন কোন জীবাণু দ্বারা এই প্রদাহ হয় সে-সম্পর্কে খুব কমই জানা গেছে।

এক জরিপে দেখা গেছে যে, যারা হাসপাতালে জন্মে তাদের ৭২%-এর নাভীর প্রদাহ হয়ে থাকে গ্রাম-নিগেটিভ জীবাণু দ্বারা (যেমন *Klebsiella, E. coli*)। আর যারা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করে তাদের গ্রাম-পজেটিভ জীবাণু (যেমন *Staphylococcus aureus*) দ্বারা বেশি হয়। বাচ্চা জন্মের প্রথম ৩ দিন নাভী সাধারণত *Clostridium tetani* নামক জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হয়ে থাকে। ফলে, বাচ্চাদের টিটেনাস বা ধনুষ্টঙ্কার হতে পারে।

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বা অস্বাস্থ্যকরভাবে নাভী কাটলে অথবা অপরিষ্কার জিনিস নাভীতে ব্যবহার করলে নাভীর প্রদাহের ঝুঁকি বাড়ে।

নাভীর প্রদাহ দুই ধরনের হতে পারে: স্থানীয় বা ভিতর-বিস্তারী। শেষেরটি রক্তনালী বন্ধ হতে বাধা দেয়, ফলে জীবাণু রক্তপ্রবাহে চলে যায়। কোনো কোনো সময় এই প্রদাহের ফলে জীবাণু পেটের ভিতরের ঝিল্লিকে সংক্রামিত করতে পারে। তখন ঝিল্লির প্রদাহ শুরু হয়। একে পেরিটোনাইটিস বলে। সেজন্য নাভীর প্রদাহ খুবই মারাত্মক। এসব ক্ষেত্রে সঠিক চিকিৎসা করা দরকার।

লক্ষণ

নাভীর চারদিক লাল হয়ে-যাওয়া, ফুলে-যাওয়া, এবং ব্যথা-হওয়া নাভীর প্রদাহের প্রধান লক্ষণ। এক্ষেত্রে নাভী দিয়ে প্রায় সব সময় রক্ত পড়ে। নাভীমূল থেকে পুঁজও পড়তে পারে। সজোরে অ্যালকোহল

দিয়ে পরিষ্কার করলে বা ঠাণ্ডা চিমটা ব্যবহার করলেও নাভী লাল হতে পারে। জ্বর, দূর্বলতা, এবং খাবারে অনিহা ও অভ্যন্তরীণ জটিলতা দেখা দিতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, ১/৩ ভাগ ক্ষেত্রে প্রদাহের স্পষ্ট কোনো বাহ্যিক লক্ষণ দেখা যায় না।

চিকিৎসা

নাভীর প্রদাহ সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করানো উচিত। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, কখন চিকিৎসা শুরু করা উচিত। যখন নাভীর চারদিক লাল হওয়া শুরু করে তখন, নাকি যখন থেকে পুঁজ পড়া শুরু করে অথবা ফুলে যায় তখন।

নাভীর গোড়ার লাল-হওয়া অংশের আয়তনের ওপর নির্ভর ক'রে অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসা শুরু করতে হয়। যদি এটি ২ সে.মি.-এর বেশি হয় তাহলে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা প্রয়োজন। আর যদি ২ সে.মি.-এর কম হয় তাহলে লক্ষ রাখতে হবে এর আয়তন বাড়ছে কি না। যদি বাচ্চার জ্বর, দুর্বলতা এবং খাবারে অনীহা দেখা যায় তবে এটিকে ব্যাকটেরিয়ার ভীষণ প্রদাহ মনে ক'রে অবশ্যই চিকিৎসা করতে হবে এবং অ্যান্টিবায়োটিক শিরাপথে দিতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে মাংসপেশীতেও দেওয়া যেতে পারে।

অ্যান্টিবায়োটিক নির্ধারণ করতে হবে কী ধরনের ব্যাকটেরিয়াজনিত প্রদাহ তার ওপর নির্ভর ক'রে। যদি তা না জানা হয় তাহলে অ্যাম্পিসিলিন ও জেন্টামাইসিন দিয়ে যুগপৎ চিকিৎসা দেওয়া যেতে পারে।

বাচ্চাদের ধনুষ্টংকার-এর ক্ষেত্রে বেশি পরিমাণে পেনিসিলিন শিরাপথে দিতে হবে এবং বিষক্রিয়া দমনের জন্য অ্যান্টিটক্সিন-এর সাহায্যে ব্যবস্থা নিতে হবে।

এক গবেষণায় দেখা গেছে, ৩৬% শিশুর ধনুষ্টংকারের সাথে নাভীর প্রদাহ ও রক্তের সংক্রমণও (sepsis) রয়েছে। সুতরাং শিশুদের ধনুষ্টংকারের ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যাকটেরিয়ার কথাও চিন্তা করতে হবে এবং শিশুর হাসপাতালে ভর্তির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধনুষ্টংকারের চিকিৎসা ছাড়াও যথাযোগ্য অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

প্রতিকার

শিশুর জন্মের পরে ধারালো ব্লেড বা কাঁচি দিয়ে নাভী কাটতে হবে। সেটিকে অবশ্যই আগে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। কোনো অবস্থাতেই অপরিষ্কার জিনিস নাভীতে লাগানো যাবে না, যেমন মাটি, গোবর, ময়লা কাপড়, ইত্যাদি। প্রথম কয়েকদিন—সাধারণত ৫-৭ দিন—নাভী ভালোভাবে ক্লোরহেক্সিডিন দিয়ে পরিষ্কার করলে নাভীতে সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়। ■

ফিরে এসেছে কালাজ্বর

মোহাম্মদ শফিউল আলম
রাশিদুল হক
দীনেশ মন্ডল
কে এম এ জামিল

ভিসিরাল লেইশমিনিয়াসিস বা কালাজ্বর প্রটোজোয়া পর্বভুক্ত লেইশমিনিয়া ডোনাভানি (*Leishmania donovani*) নামক পরজীবীর মাধ্যমে সংগঠিত হয়। কালাজ্বরের লক্ষণসমূহ হচ্ছে: কোনো বিরতি ছাড়াই একাধারে জ্বর, যকৃত ও প্লীহার স্ফীতি, রক্তস্বল্পতা, ওজন হ্রাস, দুর্বলতা, প্রভৃতি। চিকিৎসা গ্রহণ না-করলে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুর অনেক সম্ভাবনা থাকে। কালাজ্বর একটি বিশেষ প্রজাতির বেলেমাছি, ফ্লিবোটোমাস আরজেন্টিপেস (*Phlebotomus argentipes*) দ্বারা বাহিত হয়। আক্রান্ত বেলেমাছি কোনো সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ালে তিনিও আক্রান্ত হয়ে পড়েন।

পাক-ভারত উপমহাদেশে কালাজ্বরের ইতিহাস বেশ প্রাচীন, তবে দুই'শ বছর ধরে একে একটি গুরত্বপূর্ণ রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অবিভক্ত বাংলার যশোর জেলায় ১৮২৪ সনে সর্বপ্রথম কালাজ্বরের মহামারী দেখা দেয়। এ-সময় প্রায় ৭৫,০০০ লোক কালাজ্বরে মৃত্যুবরণ করে। এরপর এ-রোগ নদীয়া, চব্বিশ পরগনা, হুগলী এবং বর্ধমানসহ অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৬২ সনে ঢাকা জেলায় এবং ১৮৭২ সনে রংপুর জেলায় কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এছাড়াও, ১৮৭৩, ১৯০২, ১৯২৪ ও ১৯৪০ সনে কালাজ্বরের মহামারী সংঘটিত হওয়ার খবর পাওয়া যায়।

কালাজ্বরের জীবাণুর বাহক বেলেমাছি

ষাটের দশকে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে ডিডিটি ছিটানো হলে ম্যালেরিয়ার বাহক মশার সাথে কালাজ্বরের বাহক বেলেমাছিরও সংখ্যা কমাতে সাহায্য করে। ফলশ্রুতিতে কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব কমতে থাকে। আশির দশকে দেশব্যাপী কিছু বিক্ষিপ্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ১৯৮১, ১৯৮৭ এবং ১৯৯০ সনে যথাক্রমে সিরাজগঞ্জ, ঠাকুরগাঁ এবং টাঙ্গাইল জেলায় কালাজ্বরের বড় ধরনের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। পরিবেশ ও প্রকৃতির ওপর ডিডিটি'র খারাপ প্রভাবের কথা চিন্তা করে নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়, ফলে যোগ্য কীটনাশকের অভাবে কালাজ্বরের বাহক বেলেমাছি তথা কালাজ্বরের বিস্তার বাড়তে থাকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে। ১৯৯৪ সাল থেকে সরকারিভাবে বাংলাদেশে কালাজ্বরের শুমারী শুরু হয়। ১৯৯৪ সনে যেখানে সারা দেশে কালাজ্বর-আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা ছিলো ৩,৯৫৬ তা ২০০৫ সনে এসে দাঁড়ায় ৮,৫০৫-তে। এই ১২ বছরে (১৯৯৪-২০০৫) সারা দেশে সনাক্তকৃত কালাজ্বর রোগীর সংখ্যা ছিলো ৮১,৯৯৪। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা প্রকৃত সংখ্যা আরো অনেক বেশি। বর্তমানে দেশের ৩৪টি

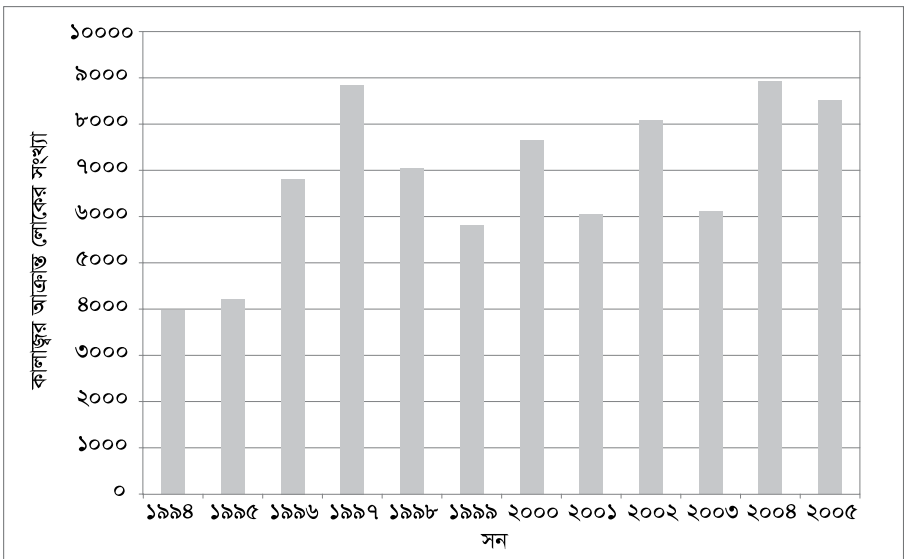

বাংলাদেশে কালাজ্বর-আক্রান্ত লোকের সংখ্যা (১৯৯৪ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত) (সূত্র: ডিজি হেলথ্ সার্ভিসেস, বাংলাদেশ)

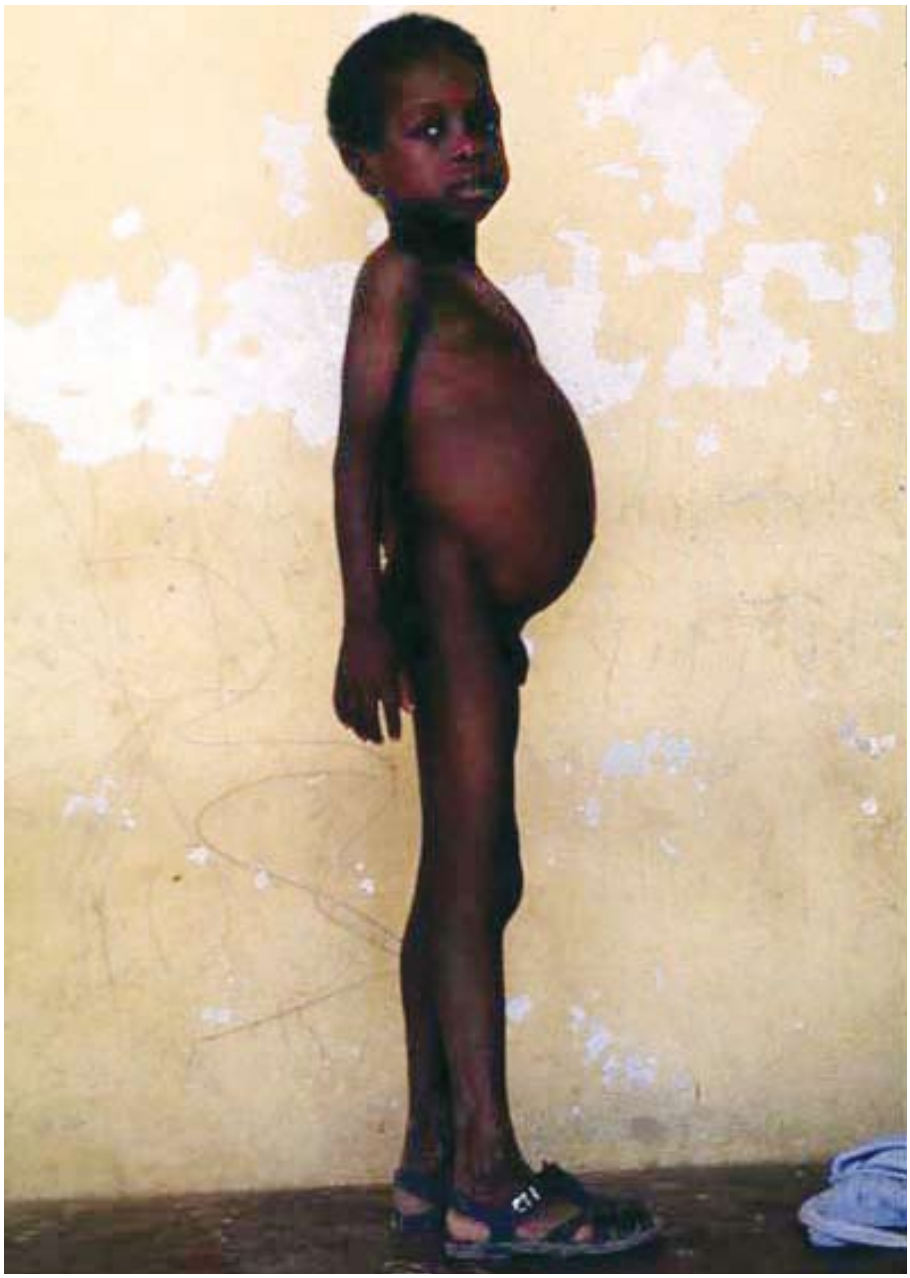

জেলায় কালাজ্বর সনাক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে কালাজ্বর-আক্রান্ত অর্ধেকের বেশি লোক বাস করে ময়মনসিংহ জেলায়। এছাড়া পাবনা, টাঙ্গাইল, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, গাজীপুর, নাটোর ও রাজশাহী জেলাতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কালাজ্বর রোগী সনাক্ত করা হয়েছে।

বেলেমাছির বৈশিষ্ট্য

এপর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ১৫ প্রজাতির বেলেমাছির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু আগে উল্লিখিত বিশেষ প্রজাতির ফ্লিবোটোমাস আরজেন্টিপেস প্রজাতির স্ত্রী-বেলেমাছি দ্বারা কালাজ্বর বাহিত হয়। খালি চোখে এ-মাছিগুলোকে সহজে সনাক্ত করা যায় না। এদের তিন জোড়া পা রয়েছে যেগুলো বেশ লম্বা। এদের পাখাগুলো সুগঠিত না-হবার কারণে বেশিক্ষণ উড়তে পারে না এবং লম্বা পা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। প্রতিলাফে সর্বোচ্চ ১ মিটারের মত উঠতে পারে। কালাজ্বরের জীবাণুবাহক বেলেমাছিগুলো মাটির ঘর কিংবা গোয়ালঘরের ফাঁক-ফোঁকরে বাস করে এবং সন্ধ্যেবেলায় বেরিয়ে এসে স্ত্রী-মাছিরা মানুষ এবং গবাদি পশুদের কামড়ায়। সাধারণত স্ত্রী-মাছিরা গোয়ালঘরের স্যাঁতস্যাঁতে আর্দ্র ও অধিক জৈব উপাদানযুক্ত আলগা মাটিতে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বের হয়ে পূর্ণাঙ্গ হবার আগ পর্যন্ত এরা মাটিতে (২-৫ সে.মি. নিচে) বাস করে।

পিকেডিএল

পোস্ট-কালাজ্বর ডার্মাল লেইশমিনিয়াসিস বা পিকেডিএল হচ্ছে কালাজ্বর-এর আরেকটি ধরন কিংবা প্রায় সমজাতীয় একটি রোগ যা সাধারণত কালাজ্বর চিকিৎসার ৬ মাস পর থেকে দেখা দিতে পারে। এতে কালাজ্বরের জীবাণু ত্বকে এসে জমা হয়। ফলে, লক্ষণ হিসেবে ত্বকে বিভিন্ন আকারের সাদা বা ধূসর বর্ণের দাগ দেখা দেয়। এর সাথে ত্বকের নিচ থেকে উঠে-আসা গোটা, লালচে দাগ কিংবা জ্বর থাকতেও পারে, নাও পারে। ধারণা করা হয়, অপ্রতুল চিকিৎসা এবং ওষুধের সাথে জীবাণুর প্রতিক্রিয়ার ফলে এমনটি ঘটে। তবে অনেক সময় এমন হয় যে, আগে কালাজ্বর হয় নি এমন ব্যক্তিরও পিকেডিএল হয়েছে। পিকেডিএল-আক্রান্ত ব্যক্তিরা রোগ সংক্রমণ প্রসারে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সনাক্তকরণ

কালাজ্বর সনাক্তকরণের সবচাইতে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হচ্ছে অস্থিমজ্জা কিংবা প্লীহা থেকে কোষ নিয়ে কালাজ্বরের জীবাণু সনাক্ত করা। কিন্তু এ-পদ্ধতিটি রোগীদের জন্য বেদনাদায়ক বলে রক্তের ড্যাট (DAT), ইলাইসা (ELISA), পিসিআর (PCR), প্রভৃতি পদ্ধতি ব্যবহার ক'রে কালাজ্বর সনাক্ত করা যায়। বাংলাদেশে ড্যাট হচ্ছে বহুল ব্যবহৃত মাধ্যম। কিন্তু এর মূল সীমাবদ্ধতা হচ্ছে, ড্যাট-এর একমাত্র রেফারেন্স ল্যাবরেটরিটি মহাখালীস্থ রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট (আইইডিসিআর)-এ অবস্থিত। ফলে, দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাঠানো নমুনাগুলো পরীক্ষা করতে বেশ সময়ের প্রয়োজন হয়। বর্তমানে নেপাল, ভারত ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে র‍্যাপিড কে-৩৯ ডিপস্টিক-এর মাধ্যমে কালাজ্বর সনাক্ত করা হচ্ছে। বাংলাদেশে বর্তমানে আইসিডিডিআর,বি এবং আইইডিসিআর তাদের গবেষণাকার্যে র‍্যাপিড কে-৩৯ ডিপস্টিক ব্যবহার করছে। সঠিকভাবে কালাজ্বর রোগী সনাক্তকরণের জন্য অনতিবিলম্বে দেশব্যাপী র‍্যাপিড কে-৩৯ ডিপস্টিক-কে সহজলভ্য করতে হবে।

চিকিৎসা

আমাদের দেশে কালাজ্বরের সবচাইতে ব্যবহৃত ওষুধ হচ্ছে সোডিয়াম অ্যান্টিমনি গ্লুকোনেট (এস-এজি) যা ইঞ্জেকশন আকারে প্রতিদিন শরীরের ওজনের প্রতি কেজির জন্য ২০ মি.গ্রা. হিসেবে শরীরের ওজন অনুযায়ী ২০ দিন মাংসপেশীতে দেওয়া হয়। বর্তমানে মিলিটোফসিন নামক একটি ট্যাবলেট পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পিকেডিএল-এর চিকিৎসার জন্য এসএজি একই নিয়মে ১২০ দিন প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, কালাজ্বর ও পিকেডিএল-এর চিকিৎসা কালাজ্বর-প্রবণ এলাকার থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। এছাড়াও, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কালাজ্বর চিকিৎসায় নিয়মিতভাবে পেন্টামেডিন ও অ্যাম্ফোটরসিন-বি এবং গবেষণামূলকভাবে পারোমোমাইসিন এবং সিটামাকুইন প্রভৃতি ওষুধও ব্যবহৃত হচ্ছে।

করণীয়

১. কালাজ্বর-প্রবণ এলাকায় যেকোনো ব্যক্তি দুই সপ্তাহের অধিক জ্বর বোধ করলে অনতিবিলম্বে নিকটস্থ সরকারি হাসপাতালে যোগাযোগ করতে হবে

২. কালাজ্বর নিশ্চিত হলে চিকিৎসা সম্পূর্ণ করতে হবে

৩. কালাজ্বরের চিকিৎসা শেষ হবার পর ত্বকের কোনো সমস্যা দেখা দিলে নিকটস্থ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অথবা জেলা হাসপাতালে যোগাযোগ করতে হবে

৪. বেলেমাছিরা সাধারণত গোয়ালঘরের আর্দ্র, স্যাঁতস্যাঁতে মাটিতে বংশবৃদ্ধি করে, তাই গোয়ালঘরের মেঝে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে

৫. দিনের বেলায় মাটির ঘরের দেয়ালের ফাঁক-ফোঁকরে বেলেমাছিরা লুকিয়ে থাকে। তাই নিয়মিত ঘর লেপতে হবে এবং দেয়ালের ফাঁক-ফোঁকর বন্ধ করে দিতে হবে

৬. বেলেমাছির কামড়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে ঘুমানোর সময় মশারী ব্যবহার করতে হবে এবং সন্ধ্যাবেলায় কয়েল এবং প্রয়োজনবোধে কীটনাশক স্প্রে ব্যবহার করতে হবে

কালাজ্বর নিয়ন্ত্রণে আইসিডিডিআর,বি-র ভূমিকা

বর্তমানে আইসিডিডিআর,বি কালাজ্বর নিয়ে মোট চারটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তিনটি কার্যক্রম চলছে ময়মনসিংহের ত্রিশালে, অন্যটি রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে। গবেষণার বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে রয়েছে কালাজ্বর-সংক্রান্ত জরিপকার্যের মানোন্নয়ন, নিম-তেল ছিটিয়ে বেলেমাছি নিয়ন্ত্রণ, বেলেমাছির নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধারণা সৃষ্টি এবং কালাজ্বরের চিকিৎসা-ব্যবস্থাপনার উন্নতিসাধন। ■

ব্রংকিয়োলাইটিস

সায়লা চৌধুরী

নিউমোনিয়ার মতো ব্রংকিয়োলাইটিস শিশুদের একটি সাধারণ রোগ। এ-রোগে শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ ঘটে, যার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা হতে পারে। সময় বিশেষে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হতে পারে। সাধারণত দুই বছরের কম-বয়সী শিশুরা এ-রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। শীতকাল ও বসন্তকালের শুরুতে এ-রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। ছেলেদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে এ-রোগ বেশি দেখা যায়।

ব্রংকিয়োলাইটিস-আক্রান্ত রোগীর এক্স-রে চিত্র

সাধারণত ভাইরাসের মাধ্যমে এই রোগ হয়ে থাকে। রেসপিরেটরী সিনসিটিয়াল ভাইরাস (RSV) এ-রোগের অন্যতম প্রধান কারণ। তাছাড়া, এ্যাডেনো ভাইরাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, রাইনো ভাইরাস ও এন্টারো ভাইরাস এ-রোগের কারণ হতে পারে। যে-মায়েরা ধুমপান করে তাদের বাচ্চাদের মধ্যে এ-রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি দেখা গেছে।

এ-রোগে আক্রান্ত হলে বাচ্চাদের সাধারণত সর্দি-কাশি, হাঁচি, জ্বর, ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। তাছাড়া, কমবেশি শ্বাসকষ্ট হবে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে শব্দ হতে পারে। এই সময় শিশুদের খেতে অসুবিধা হতে পারে।

এ-রোগ হলে শিশুকে তরলজাতীয় খাবার বেশি দিতে হয় এবং জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল দিতে হবে। শিশুর শ্বাসকষ্ট যদি বেড়ে যায় তাহলে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে। তাছাড়া, শিশুর যদি বমি হয় এবং তরলজাতীয় খাবার খেতে না-পারে, তাহলেও শিশুকে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে। শিশুর ত্বক, বিশেষ করে ঠোঁট ও নাক, যদি নীলচে হয়, তাহলে অবশ্যই শিশুকে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে। আর শিশুর যদি হার্টের জন্মগত কোনো সমস্যা থাকে, সেক্ষেত্রেও ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে।

শিশুর এই রোগ যদি মৃদু পর্যায়ে থাকে তবে ডাক্তার মাকে কিছু উপদেশ দিয়ে থাকেন, তা হলো: শিশুকে আরামপ্রদ পরিবেশে ঢিলে-ঢালা পোশাকে রাখতে হবে; তরল খাবার পরিমাণমত দিতে হবে, যাতে পানিশূন্যতা না হয়; বুকের দুধ নিয়মিত খাওয়াতে হবে; কিছুক্ষণ পরপর শ্বাস-প্রশ্বাস ও শরীরের তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আর মাকে এই ধারণা দিতে হবে যে, সময়মত সঠিক চিকিৎসা হলে এ-রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করে না। তবে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি যদি বেড়ে যায় তাহলে শিশুকে অবশ্যই হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

এ-রোগের জন্য শিশুরা যেধরনের চিকিৎসা হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পেয়ে থাকে তা হলো: শিশুকে অক্সিজেন দেওয়া হয়, ঠাণ্ডা ঘরে রাখা হয়, যাতে পানিশূন্যতা দেখা না দেয়। মাথা ও বুক বালিশের উপর একটু উঁচু করে রাখা হয়, যাতে ঘাড় ও গলার অবস্থান শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য সহায়ক হয়। কোনো কোনো সময় শিরায় স্যালাইনজাতীয় ওষুধ দেওয়া হয়। সাধারণত কোনো অ্যান্টিবায়োটিকের দরকার হয় না। কিন্তু সঙ্গে ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ থাকলে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। এ-রোগের সাথে জন্মগত হৃদরোগ থাকলে এন্টিভাইরাল অর্থাৎ ভাইরাস ধ্বংসকারী ওষুধ দেওয়া হয়। সাধারণত ব্রংকোডাইলেটরজাতীয় ওষুধ, যেমন সালবিউটামল দেওয়া হয়। করটিকোস্টারয়েড দিয়ে এ-রোগের চিকিৎসার বিষয়টি নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে। ■

আইসিডিডিআর,বি স্টাফ ক্লিনিক থেকে

হঠাৎ করে অজ্ঞান হওয়া

অনেক কারণে একজন মানুষ হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। পারিবারিক কলহের পরে আবেগতাড়িত হয়ে মুর্ছা যেতে পারে অথবা অন্য কোনো মারাত্মক অসুখের কারণেও এমন হতে পারে। যে কারণেই হোক, আপনার সামনে একজন মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়লে তার সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া আপনার নৈতিক দায়িত্ব। একজন মানুষের প্রতি অন্য একজন মানুষের এতটুকু দায়িত্ববোধ থাকতেই হবে। ঐ জরুরী মুহূর্তে কী করা দরকার তা যদি আপনার জানা থাকে তবে আপনি সেই অসহায় লোকটির জন্য বিরাট কিছু করতে পারেন। এমনকি লোকটি প্রাণেও বেঁচে যেতে পারে।

- প্রথমে আপনি অজ্ঞান ব্যক্তিটির নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করুন (হাতের কব্জির কাছে বা গলার কাছে)। যদি নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করা যায় এবং যদি তা স্বাভাবিক মাত্রায় থাকে তবে মনে করবেন খুব মারাত্মক কিছু হয়তো হয় নি
- অজ্ঞান ব্যক্তিকে শক্ত জায়গায় সোজা অবস্থায় চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে মাথা কাত করে দিন এবং শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে কি না লক্ষ করুন
- শরীরের কাপড় ঢিলা করে দিন এবং চোখে-মুখে ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা দিন
- লোকজনের ভিড় কমিয়ে বাতাস চলাচলের সুযোগ করে দিন
- দাঁত লেগে থাকলে তা খুলে দিন এবং মুখের ভিতরে একটা চামচ দিয়ে জিহ্বাটাকে দাবিয়ে রাখুন
- মুখের ভিতরে কোনোকিছু (খাদ্যদ্রব্য, ময়লা, কফ, রক্ত, নকল দাঁত, ইত্যাদি) থাকলে তা বের করে ফেলুন

- অজ্ঞান-হওয়া ব্যক্তির যদি নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত না-হয় অথবা শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ থাকে তবে বুঝতে হবে এটা একটা মারাত্মক অবস্থা এবং রোগীর তাৎক্ষণিক চিকিৎসা (CPR) অপরিহার্য। কেননা, এ-অবস্থা যদি ৩ মিনিট স্থায়ী হয় তবে রোগীর মস্তিস্কের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে, এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। সেজন্য তাৎক্ষণিকভাবে আপনাকে যা করতে হবে তা হলো:

A⟶Airway বা শ্বাসনালী ঠিক-রাখা

B⟶Breathing বা শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা

C⟶Blood circulation বা রক্ত সঞ্চালনের জন্য কার্ডিয়াক ম্যাসাজ করা

ক. আপনি যদি একা থাকেন তবে সাহায্যের জন্য আরেকজনকে ডাকুন

খ. রোগীকে মেঝেতে বা শক্ত বিছানায় চিৎ করে শুইয়ে দিন এবং বুকের মাঝখানে জোরে ১টা কিল দিয়ে দেখুন নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয় কি না। যদি স্পন্দন অনুভূত না হয় তবে থুতনির নিচে হাত দিয়ে মাথাটাকে পিছনের দিকে টেনে নিন যেন গলাটা সামনের দিকে টানটান হয়ে যায়

গ. এবার রোগীর পাশে হাঁটু গেড়ে বসুন। দু'আঙুল দিয়ে রোগীর নাক চেপে ধরে আপনি লম্বা শ্বাস নিয়ে রোগীর মুখের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে মাঝারি জোরে ফুঁ দিন। আবার একইভাবে একবার ফুঁ দিন এবং লক্ষ করুন রোগী শ্বাস নিচ্ছে কি না বা নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয় কি না

ঘ. রোগীর শ্বাস নেওয়া শুরু না হলে বা নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করা না গেলে বুকের উপরের কাপড় সরিয়ে ফেলুন। বাম হাতের কব্জি বুকের মধ্যখানে 'স্টারনাম হাড়ের' নিচের তৃতীয়াংশের উপর রাখুন এবং ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উপরে জোরে চাপ দিন যেন 'স্টারনাম' ১ ইঞ্চি পরিমাণ দেবে যায়। এটাকে বলা হয় কার্ডিয়াক ম্যাসাজ। আপনি যদি একাই এ-কাজটি করেন তবে ১৫ বার বুকে চাপ দেওয়ার পর ২ বার মুখে ফুঁ দিবেন। যদি ২ জনে করেন তবে ১ জন ৬ বার বুকে চাপ (কার্ডিয়াক ম্যাসাজ) দেয়ার পর অন্যজন মুখে ১ বার ফুঁ দেবেন। কাজটি এভাবে করলে আরও ভালো হবে: মুখে উচ্চারণ করবেন ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬ এবং প্রত্যেকবার মুখে উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে বুকে চাপ দেবেন ও ১০৬ বলে বুকে চাপ দেওয়া হয়ে গেলে অন্যজন মুখে ১ বার ফুঁ দেবেন। এ-প্রক্রিয়া চালাতে থাকবেন এবং মাঝে মাঝে গলার কাছে পরীক্ষা করে দেখবেন নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে কি না। যতক্ষণ না রোগী শ্বাস নেওয়া শুরু করে বা নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করা না-যায় ততক্ষণ এ-প্রক্রিয়া চালাতে থাকুন। ■

ডা: মতিউর রহমান
স্টাফ ক্লিনিক, আইসিডিডিআর,বি

লেখা আহ্বান

আইসিডিডিআর,বি থেকে প্রকাশিত স্বাস্থ্য সংলাপ নামের চতুর্মাসিক এই বাংলা ম্যাগাজিনের জন্য লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। কেন্দ্রের বাইরের যেকোনো ব্যক্তিও লেখা পাঠাতে পারেন, তবে সেক্ষত্রে তাঁকে/তাঁদেরকে অবশ্যই কেন্দ্রে কর্মরত একজনকে সহ-লেখক হিসেবে মনোনীত করতে হবে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা: এম শামসুল ইসলাম খান, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, স্বাস্থ্য সংলাপ, আইসিডিডিআর,বি, মহাখালি, ঢাকা ১২১২ অথবা জিপিও বক্স ১২৮, রমনা, ঢাকা ১০০০